দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ দিয়ে শুরু?

সরকারি ও প্রধান বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের সংঘর্ষের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ। বিগত সরকারের আমলে উল্লিখিত কলেজ ক্যাম্পাস ছাড়তে হয়েছিল ছাত্রলীগকে। দীর্ঘদিন পর তারা ফিরে এসে মিছিল বের করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় বলে পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছে। সংঘর্ষের জন্য এক পক্ষ অপর পক্ষকে দায়ী করছে, যথারীতি। যে পক্ষই দায়ী হোক, গত রোববারের ঐ সংঘর্ষের ফলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন গোটা এলাকা জুড়ে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘ সময় ধরে বন্দুকযুদ্ধ চলেছে। দু'পক্ষে বেশ ক'জন আহত হয়েছে। আহত একজন ছাত্রলীগ নেতার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে সভা ডেকে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ঘটনা এ যাবৎ এত ঘটেছে যে, এ নিয়ে নতুন করে মন্তব্য করার কিছু নেই। তবে এ তথ্যটি উল্লেখযোগ্য যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবার পর এই প্রথম ছাত্র সংঘর্ষের কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের শেষদিকে অনেকটা একই ধরনের সংঘর্ষের কারণে খুলনা বিআইটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

বিচারপতি মোঃ হাবিবুর রহমান সরকারের শাসনামলে প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের পাকড়াও করার কাজটা ভালোভাবে করা হয়নি কিংবা যায়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান যাও কিছু ফলপ্রসূ হয়েছে, ক্যাম্পাসে পুলিশের তৎপরতা মোটেই জোরদার হয়নি। সুতরাং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘাপটি মেরে থাকা ও সক্রিয় ছাত্র নামধারী 'ক্যাডার'দের দমন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েই গেছে। নতুন সরকার এ ব্যাপারে কি করবেন তা দেখার জন্য জাতি বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজি নয়। ক্ষমতায় পালা-বদলের হাওয়ায় সরকারি ও বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যও বদলাচ্ছে মনে হয়। নতুন করে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা যে আরও ঘটবে, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা তার প্রমাণ দিচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি যেরকম সহিংস হয়ে উঠেছে, তাতে বড় কোন সংঘর্ষ হলেই আরও বড় সংঘর্ষের আশংকায় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। এটা যে কোন সমাধান নয়, সে ব্যাপারে সবাই একমত। উপরন্তু এজন্য যে মূল্যবান শিক্ষাজীবনের বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়, তা নিয়েও আলোচনা গত ক'বছরে কম হয়নি। তার ফল যে একেবারে কিছুই হয়নি তাও বলা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে দৃশ্যত একমত হয়েছে যে, সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের মতোই ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের দলীয় প্রশ্রয় দেয়াটাই সব সমস্যার মূলে। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারের আমলেই এটা কম-বেশি লক্ষ্য করা গেছে যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনই বেশি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তারা প্রশাসনিক প্রশ্রয় পেয়েছে। বিগত সরকারের আমলে এই প্রক্রিয়াই চরমে উঠেছিল।

বর্তমান সরকার প্রধান যখন বিরোধীদলীয় নেত্রী ছিলেন, তখন তিনি বারবারই এসব প্রসঙ্গ তুলেছেন। ছাত্র রাজনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাঙ্গনকে সুস্থ-স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে শাসক দলের 'মূল দায়িত্বে'র প্রশ্নও তিনি উত্থাপন করেছিলেন অত্যন্ত সঠিকভাবে। তাতে ফল কিছু হয়েছিল কিনা তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলার বোধহয় দরকার নেই।

নতুন সরকার প্রধান ও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমরা এটা দাবি করতে পারি যে, দল নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার যে নীতি তারা ঘোষণা করেছেন, তা বাস্তবায়নে সততা ও মনোবলের অভাব যেন আমরা না দেখি। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে তা দূর করা যে রাতারাতি সম্ভব হবে না, একথা মানুষ বোঝে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল যদি প্রথমে দলীয় ছাত্র সংগঠনটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয় এবং নিজেদের কর্মীদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে বাধ্য করে, তবে ছাত্র রাজনীতির 'ক্যাডার'দের জব্দ করার কাজে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়বে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীদের দমনে যেসব বাধা-বিঘ্ন আসে, সেগুলো মোকাবেলায় জনগণের ব্যাপক সমর্থনও পাওয়া যাবে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হওয়া দিয়ে শিক্ষাঙ্গন অচল হয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হয়েছে, তা ঠেকানো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারও রয়েছে। চট্টগ্রামে গত রোববার যা হয়েছে, সে ব্যাপারে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক। পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতিকে দুষণমুক্ত করার প্রত্যাশিত কাজটির সূচনাও অবিলম্বে করা হোক।